প্রবন্ধ

আরাকানের অতীত ও বর্তমান

মাওলানা আবদুস সুবহান বিশ্বনাথী

বাংলাদেশের দক্ষিন পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আরাকান রাজ্য। বঙ্গোপসাগর ও পাহাড়ঘেরা একটি অত্যন্ত সুন্দর দেশ। পূর্বদিকে সুউচ্চ ও বিশাল আরাকান পাহাড়ের মাধ্যমে এই দেশটি বার্মার মূল ভূ-খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ভৌগলিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে আছে। নাফনদীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে রাজনৈতিক সীমারেখায় বিভক্ত। নদ নদী ও বনাঞ্চল বিশিষ্ট সবুজ শ্যামল আরাকান প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এক সময়ে রোহাং নামে পরিচিত আরাকান ছিল একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ। হিজরী ১ম শতাব্দি হতেই আরাকানে আরব মুসলিম বণিকেরা আগমন করে এবং ইসলাম প্রচার করে।

১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানে বৌদ্ধ রাজার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে এখানে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘ সাড়ে তিন শত বছর (১৭৮৪ খ্রি.) পর্যন্ত আরাকানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামের সুদীর্ঘ সুশীতল ছায়ায় আরাকানে একটি উন্নত ইসলামী সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যা রোহাং সভ্যতা নামে খ্যাত। জন সংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ রোহিঙ্গা মুসলিম। মুসলমান দরবেশ বাদশাগণ আরাকানকে একটি সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন।

আরাকানের উত্তরে চীন ও ভারত দক্ষিন পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর উত্তর পশ্চিমে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম। পূর্বে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী ইলোমা পর্বতমালা। এই সুদীর্ঘ দুর্গম সুউচ্চ ও বিশাল ইলোমা পর্বতমালা ব্র?হ্মদেশ (মিয়ানমার) হতে আরাকানকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তবে কয়েকটি দুর্গম গিরিপথই আরাকান মিয়ানমার যাতায়াতের একমাত্র স্থলপথ, যা সামরিক প্রয়োজন সর্বোসাধারণের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। আরাকানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই অনুন্নত যে সকল মৌসুমে গাড়ী চলাচলের উপযোগী মাত্র ১৫০ মাইল রাস্তা। মূল বার্মার ভূ-খণ্ডের সাথে আরাকানের যোগাযোগ প্রধানত সমুদ্র তথা জলপথ ও আকাশ পথে।

মিয়ানমারের আয়তন ২, ৬১, ৯৭০ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৬ কোটিরও বেশী। ২০ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে আরাকান অবস্থিত। মিয়ানমারের ১৩৫টি জাতি গোষ্ঠির মধ্যে মুসলমানরা হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠি। এদের সংখ্যা ৮০ লাখেরও বেশি। আরাকানের জমি খুবই উর্বর। তাই প্রচুর পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে আরাকানের চাউল রপ্তানী হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আরাকান প্রসিদ্ধ। আরাকানের ৩৬০ মাইল ব্যাপি দীর্ঘ উপকুল মৎস সম্পদে সমৃদ্ধ। তবে মুসলমানদের উপর মাছ ধরার ক্ষেত্রে বর্মী সরকার বাধানিষেধ আরোপ করে রেখেছে। আরাকানের স্থল ভূমির ৭০ ভাগ বনাঞ্চল দ্বারা আবৃত, যেখানে অত্যন্ত উন্নত মানের কাঠ উৎপন্ন হয়। আরাকানের পাহাড়ী এলাকার উৎপন্ন সেগুন কাঠ বার্মার মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ। বার্মা ও আরাকানের মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক পরিসংখ্যান লাভ কারা কঠিন। রুদ্ধদ্বার দেশ হওয়ার কারনে সেখানের পরিস্থিতি এবং জনসংখ্যা বিন্যাস উভয়ই অস্পষ্ট। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ। তবে আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্টের বিবরণে ৮০ লাখ ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে আরাকানে বসবাস রত মুসলিম

অমুসলিম সমান সমান। এর কারণ বিগত অর্ধশতকের মুসলিম নিধন ও বিতাড়ন নীতির ফল। রোহিঙ্গারা মুলত আরব তুর্কী, ইরানী, মোঙ্গল, পাঠান বংশদ্ভোত।

পটভূমি

৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানে হিন্দু চন্দ্রবংশীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজধানী ধান্যবতী হতে লেম্রত নদীর মোহনার ৫০ মাইল উপরে ভেসালীতে স্থানান্তরিত হয়। আরব বণিকেরা চীনদেশ পর্যন্ত বাণিজ্য যাতায়াতকালে আরাকানে যাত্রা বিরতি করত এবং সেখানকার মূল্যবান সেগুন কাঠ দিয়ে জাহাজ প্রস্তুত ও মেরামত করত। ঐতিহাসিক আর. সি. স্মার্ট বলেন– ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পূর্ব হতেই আরব ব্যবসায়ীগণ আরাকানের লোকদের গভীর সংস্পর্শে আসে এবং সেই সময় হতেই তারা সেখানে ইসলাম প্রচার করতে থাকে। খ্রিষ্টীয় ৮ম শতকে আরব বাণিজ্য নৌবহর রাহাম্বী ও চেদুরা উপকূলে আশ্রয় নিত। তখন হতেই আরব বণিকগণ স্থানীয় মহিলাদের বিবাহ করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। পরবর্তী শতাব্দিসমূহে ইসলাম দ্রুত গতিতে প্রসারিত হতে থাকে যা খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দির মধ্যে আসাম হতে মালয় উপকূল ব্যাপি ছড়িয়েছিল এবং এসব অঞ্চলে কোন রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রচার হয়েছিল এবং শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত থেকেছে।

১৪০৬ খ্রি. বার্মার রাজা আরাকান আক্রমন করে এবং আরাকানের রাজধানী শহর লংপ্রেট ধ্বংস করে দেয়। তখন আরাকানের বৌদ্ধ রাজা নরমিখলা বাংলায় পালিয়ে এসে গৌড়ের সুলতান নাসির উদ্দিন শাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। নরমিখলা গৌড়ে ১৪ বছর অবস্থান করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে সুলায়মান শাহ মুসলিম নাম গ্রহণ করেন। নরমিখলা গৌড়ের সুলতান নাসির উদ্দিনের সেনাপতি ওয়ালী খানের সাহায্যে বর্মীদের হটিয়ে আরাকানের সিংহাসনে বসেন। সুলতান নাসির উদ্দিনের সহযোগিতায় বাদশা সুলায়মান শাহ কর্তৃক ১৪৩০ খ্রী. আরাকানে ১ম মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলায়মান শাহ রাজধানী শহর মরুহং এ স্থানান্তরিত করেন। তার রাজত্ব কালে আরাকানে মুসলিম রেনেসাঁর যুগ শুরু হয।

১৭৮৪ খ্রি. বর্মী বৌদ্ধ রাজা বুঁদাপায়া আরাকান আক্রমণ করে দখল করে নেয়। এই রাজা আরাকানে রাজকীয় গ্রন্থাগার এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে ফেলে। অন্যদিকে প্যাগোডা, মন্দির ও ভিক্ষু বিহার নির্মাণ করে মুসলিম আরাকানকে বৈশিষ্টগতভাবেও একটি বৌদ্ধরাজ্যে পরিণত করে। হাজার হাজার মুসলমান পালিয়ে বৃটিশ শাসিত বাংলায় চলে আসে। ১৮২৩ খ্রি. বৃটিশরা স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আরাকান দখল করে নেয়, যা ১ম ইংরেজ বর্মী যুদ্ধনামে খ্যাত। আরকান বৃটিশ শাসনে আসার পর সেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। রোহিঙ্গারা ৪০ বছর পর বাংলা হতে আরাকানে নিজস্ব বাসভূমিতে ফিরে আসতে থাকে। ত্রিশের দশকে বর্মিগণ থার্কিম পার্টির নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে এবং আরাকানের বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। মুসলিমানদেরকে তাদের দল থেকে বাহিরে রাখা হয়। বর্মী নেতা অউং সান মগনেতাদেরকে আরাকানের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করে এবং বৃটিশরা চিরাচরিত মুসলিম বিদ্ধেষের কারণে তা মেনে নেয়।

বর্মি রাজা বুঁদাপায়া কর্তৃক ১৭৮৪ খ্রি. মিয়ানমারের সাথে সম্পৃক্ত করার আগ পর্যন্ত আরাকান স্বাধীন ছিল। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনে আরাকান কখনো সাংস্কৃতিক সামাজিক ভৌগলিকভাবে মিয়ানমারের অংশ ছিল না। কিন্তু ১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারী বার্মার স্বাধীনতা লাভের সময় বৃটিশ আরাকানের সার্বভৌমত্ব শায়ত্বশাসনসহ মিয়ানমারের হাতে ন্যাস্ত করে। ১৯৪৮ সালে বার্মা সরকার আরাকানকে শায়ত্বশাসন প্রদান করেছিল ঠিক, কিন্তু ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন এর সামরিক সরকার আরাকানের শায়ত্বশাসন প্রত্যাহার করে।

১৯৮২ সালে নে উইন বৈষম্যমূলক নাগরিক আইন পাশ করেন। এই আইনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার ও ভৌটাধিকার কেড়ে নেয়া হয়। তাদেরকে বহিরাগত বিদেশী জনগোষ্ঠি আখ্যায়িত করে নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে বর্মী সরকার। নিজ গ্রামের বাহিরে যেতে হলে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। বিয়ে করা, সন্তান জন্ম দেয়া, সম্পত্তির মালিকানার ব্যপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে। আরাকানে ১৩৫ টি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির তালিকা থেকে রোহিঙ্গাদের বাদ দেয়া হয়। বর্মী সরকার আরাকান থেকে মুসলমানদের নির্মূল এবং মসজিদ মাদরাসা ধ্বংস করে ইসলামী ঐতিহ্য ও নিদর্শন সম্পূর্ণ রূপে মুছে ফেলে আরাকানকে একটি বৌদ্ধ রাজ্যে পরিণত করার যাবতীয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন বৃদ্ধি করা হচ্ছে যাতে তারা সে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যা আজো অব্যহত আছে। বার্মার স্বাধীনতা লাভের পর ১৫ লাখ মুসলমান আরাকান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। বহু রোহিঙ্গা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও সৌদি আরবে আশ্রয় নিয়েছে।

১৯৩৮ সালে ৩০ হাজার রোহিঙ্গা হত্যা করা হয়। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে গণহত্যায় ১ লাখ রোহিঙ্গাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৯৪৮ হইতে ১৯৯২ ইং পর্যন্ত আরাকানে অনুরূপ ১৪ টি গণহত্যা ও বিতাড়ন অভিযান চলে। ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, জাতিগত ও ধর্মীয় কারণে বার্মার সমাজ রাজনীতি এবং ধর্মীয় গোষ্ঠির সঙ্গে রোহিঙ্গাদের বহু আগ থেকেই একটা বড় দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে আছে।

১৯৪৭-৪৮ সালে রোহিঙ্গাদের কিছু স্থানীয় নেতা আরাকানকে পূর্ব পাকিস্থানের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। যদিও সেটি তখন তেমন গুরুত্ব পায়নি। সুতরাং ৪৮ সাল থেকেই বার্মিজ এবং তাদের শাসকদের কাছে রোহিঙ্গারা জাতিগতভাবে সন্দেহের পাত্রে পরিণত হয়। বার্মিজ শাসকদের বৈষম্যমূলক নির্যাতন নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠে বিদ্রোহী সংস্থা যা এক সময়ে সশস্ত্র সংগঠনের রূপ নেয়। কিন্তু সশস্ত্র তৎপরতা বেশি দূর এগুতে পারেনি, কারণ নিকট প্রতিবেশী কোনো দেশের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কার্যকর সশস্ত্র তৎপরতা চালানো সম্ভব হয় না।

১৯৯১ সালে আবারো সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান চালায় এসময় তিন লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। কিছু রোহিঙ্গাদেরকে বার্মা সরকার ফিরিয়ে নিলেও এখনও ৫ লাখের মতো রোহিঙ্গা কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় একরকম স্থায়ী বসতি গেড়ে বসেছে। ২০১২ সালে আবারো বৌদ্ধরা হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করে। এ সময় উগ্র বৌদ্ধরা মুসলমানদের গ্রামগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এক লাখ পঁচিশ হাজার রোহিঙ্গা আশ্রয়হীন হয়ে

পড়ে। মিয়ামারের রোহিঙ্গা মুসলমানরা বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠী। এক সময়ে যাদের ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। এখন তারাই ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর বলির শিকার।

হাজার বছর পূর্বে মুসলমানরাই এক সময় আরাকান শাসন করত। সেই মুসলিম জাতিকে চূড়ান্ত নির্মূল করার জন্য মুসলিম রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে বিদেশী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাদেরকে বৃটিশ শাসনামলের বার্মায় এসে বসতি স্থাপনকারী অবৈধ অভিবাসী বাঙ্গালী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এখন নিজ দেশে তারা শরণার্থী। রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন এটা নতুন নয়, প্রায়ই রোহিঙ্গাদের উপর সরকারে বাহিনী, কোন সময় উগ্র বৌদ্ধরা, কখনো উভয় পক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করে আসছে। বৌদ্ধ ধর্মে জীব হত্যা মহাপাপ হলেও, তারা কাজের মাধ্যমে সে বাণীকে অস্বীকার করছে।

গত ৯ অক্টোবর পুলিশ ক্যাম্পে আক্রমণের সৃষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে দেশের সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও উগ্রবৌদ্ধরা এমন নৃসংশ গণহত্যা, নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়, যা পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। এসব নারকীয়তার বাস্তবচিত্র আজ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৃশ্যমান। সেনাবাহিনী নারীদের ধর্ষণ করছে। শিশুদের নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্য করছে। শিশুদের উত্তপ্ত গরম পানির মধ্যে ফেলে নির্মমভাবে হত্যা করছে। শিশুদের একত্রিত করে তাদের হাতের উপর মটর সাইকেল তুলে হাত ভেঙ্গে দিচ্ছে। কুকুর দিয়ে কামড়িয়ে হত্যা করছে। কারো কারো গায়ের চামড়া খুলে নিচ্ছে। গাছের সাথে বেধে উলঙ্গ করে তাদের পেটাচ্ছে। গরম পাইপ দিয়ে জীবন্ত মানুষকে ছ্যাকা দিচ্ছে। কাউকে আগুনে পুড়িয়ে সে দৃশ্য হাসি ঠাট্টা করে অবলোকন করছে উগ্র বৌদ্ধরা। কোথাও আবার রোহিঙ্গাদের নদীর তীরে জড়ো করে নির্মমভাবে হত্যা করছে। সাড়ে তিন হাজার বাড়ীঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ঘর বাড়ী হারিয়েছেন ত্রিশ হাজারেরও বেশী মানুষ। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মানুষ যখন বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে গুলি করে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের রক্তে ভিজে গেছে আরাকানের মাটি। রোহিঙ্গারা যেখানে গিয়ে লুকাচ্ছে, সেখানে রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পথে ঘাটে খালে নদীতে তাদেরকে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে হত্যা করছে। লোকজন নৌকায় করে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে চাইলে তাদের নৌকায় গুলি করা হচ্ছে। আরাকান থেকে রোহিঙ্গা উচ্ছেদের জন্য মিয়ানমার সরকার উৎ পেতে থাকে ৯ই অক্টোবর সীমান্ত চৌকিতে হামলার পর সেটা আর বুঝার বাকি থাকে না। মনে হয় মিয়ানমার সরকার এমন একটি ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঐ ঘটনাটি কারা ঘটিয়েছে সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এর সূত্র ধরে পুরো রাজ্যে সেনাবাহিনী ভারী অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্র একটি গোষ্ঠির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গণহত্যা শুরু হওয়ার পর থেকে সাংবাদিক ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে ঐ এলাকায় প্রবেশে বাধা নিষেধ আরোপ করেছে। বিশেষ সফররত জাতিসংঙ্ঘ প্রতিনিধিকে আরাকানের দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে বাঁধা দিয়েছে বৌদ্ধ মৌলবাদ প্রভাবিত সরকার।

আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর যে গণহত্যা চলছে তা চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন। পূর্বপুরুষদের ভিটেবাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানরা এখন খোলা আকাশের নিচে

মানবেতর জীবন যাপন করছে। অথচ বিশ্ব বিবেক নিরব। আন্তর্জাতিক মহল এখন পর্যন্ত মিয়ানমারের অসহায় রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত এই নিষ্ঠুরতার শুধু উদ্বেগ প্রকাশের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। যেখানে তাদের উচিৎ ছিল এই নিষ্ঠুরতা বন্ধের জন্য বার্মার উপর চাপ সৃষ্টি করা। সামরিক ব্যবস্থা নেয়া। অবরোধ আরোপ করা, কিন্তু তা তারা করেনি। ফলে বার্মা সরকার অবাধে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা ও নিষ্ঠুরতা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার কথা না বলে বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে জাতিসংঘ। রোহিঙ্গারা মুসলিম বলেই কি বিশ্বের পরাশক্তি দেশগুলোর কাছে অবহেলিত? রোহিঙ্গারা মুসলমান না হয়ে অন্য ধর্মের লোক হলে তাহলে পরাশক্তি দেশগুলো কি বসে থাকত?

অং সান সূচী'র দল এন এলডি ক্ষমতায় আশায় বিশ্ববাসী আশা করছিল, বঞ্চিত অবহেলিত নির্যাতিত রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিক অধিকার ফিরে পাবে, ফিরে পাবে তাদের ন্যায্য অধিকারও, কিন্তু তিনি রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটুও উদ্যোগ নেননি, এজন্য তার শান্তিতে নোবেল প্রাপ্তির বিষয়টি বিতর্কিত ও সমালোচিত হচ্ছে। বরং তিনি বৌদ্ধদের পক্ষে সাফাই গাইছেন এবং রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের নির্মম চিত্রগুলোকে অস্বীকার করছেন। অথচ ইতোপূর্বে সারা দুনিয়ার সোস্যাল মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ায় রোহিঙ্গা নির্যাতনের লোমহর্ষক চিত্র ও করুণ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, হচ্ছে।

সুতরাং আরাকানের মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের নাগরিক অধিকার সহ যাবতীয় নাগরিক সুবিধা প্রদান করতে মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঙ্ঘ, ও. আই. সি সহ আন্তর্জাতিক মহলকে এগিয়ে আসা একান্ত জরুরী। বাংলাদেশ সরকারকেও এ ব্যাপারে কুটনৈতিক ভূমিকা পালন করা জরুরী মনে করি।

লেখক: শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া আজিমগঞ্জ, বড়লেখা, মৌলভী বাজার, সিলেট।